চিরায়ত বই

১৮

দেবদাস

দেবদাস

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

দেবদাস
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

প্রকাশকাল
কবি প্রকাশনী প্রথম প্রকাশ : জুন ২০২৩

প্রকাশক
সজল আহমেদ
কবি প্রকাশনী
৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম বেইজমেন্ট
২৫৩-২৫৪ এলিফ্যান্ট রোড কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

স্বত্ব
লেখক

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
সব্যসাচী হাজরা

নান্দীমুখ
শেখ মোহাম্মদ সালেহ্ রাব্বী

বর্ণবিন্যাস
মোবারক হোসেন

মুদ্রণ
কবি প্রেস
৪৮৩-৪৮৬ গাউসুল আজম সুপার মার্কেট নীলক্ষেত ঢাকা ১২০৫

ভারতে পরিবেশক
অভিযান বুক ক্যাফে বুকস অফ বেঙ্গল বইবাংলা দে'জ পাবলিশিং কলকাতা

মূল্য: ২০০ টাকা

Devdas A novel by Sarat Chandra Chattopadhyay Published by
Kobi Prokashani 85 Concord Emporium Market Kantabon Dhaka 1205
Kobi Prokashani First Edition: June 2023
Phone: 02-44617335 Cell: +88-01717217335 +88-01641863570 (bKash)
Price: 200 Taka RS: 200 US$ 12
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: kobibd.com

ISBN: 978-984-97729-5-8

ঘরে বসে কবি প্রকাশনী'র যে কোনো বই কিনতে ভিজিট করুন
www.kobibd.com or www.kanamachhi.com
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৬৪১-৮৬৩৫৭১
www.rokomari.com/kobipublisher
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৫১৯-৫২১৯৭১ হটলাইন ১৬২৯৭

দেবদাস শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রথম জীবনের রচনা। কিশোর বয়সে তিনি যখন বিহারের ভাগলপুরের খঞ্জরপুর পল্লিতে থাকতেন, সে সময় লুকিয়ে উপন্যাসটি লেখা শুরু করেন। যদিও এ লেখা নিয়ে তিনি এক ধরনের দোলাচলে ভুগেছেন। ১৯১৩ সালের জুন মাসে বন্ধু প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে লেখা এক চিঠিতে *দেবদাস* বিষয়ে জানিয়েছিলেন, 'শুধু যে ওটা আমার মাতাল হয়ে লেখা তাই নয়, ওটার জন্যে আমি নিজেও লজ্জিত।...' একই বছরের ১৭ জুলাই প্রমথনাথকে লেখা আরেক চিঠিতে ওই বিষয়ে আরও বলেছেন, 'ওই বইটা একেবারে মাতাল হইয়া বোতল খাইয়া লেখা।'

সম্ভবত বন্ধু ও প্রকাশকের তাগাদার কারণেই শরৎচন্দ্র পরে *দেবদাস* কিছুটা ঠিকঠাক করে ছাপার ব্যাপারে মনস্থির করেন। *ভারতবর্ষ* পত্রিকার ১৩২৩ বঙ্গাব্দের চৈত্র ও ১৩২৪-এর বৈশাখ-আষাঢ় সংখ্যায় উপন্যাসটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। *ভারতবর্ষ* গোষ্ঠীরই মালিকানাধীন প্রকাশনা সংস্থা গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যান্ড সন্স থেকে ১৯১৭ সালের জুন মাসের ৩০ তারিখে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় উপন্যাসটি। এ জন্য অগ্রিম পারিশ্রমিক হিসেবে লেখক পেয়েছিলেন দুই হাজার টাকা।

শরৎচন্দ্র, গোপালচন্দ্র রায়

হিন্দি ভাষায় শরৎ-জীবনীকার বিষ্ণু প্রভাকরের ধারণা, পার্বতী চরিত্রের মূলে রয়েছে শরৎচন্দ্রের বিদ্যালয়-জীবনের এক বান্ধবী ধীরু। তাঁর প্রতি শরতের মোহ ও ভালোবাসা খুব সহজে যায়নি। সেই ব্যর্থ প্রেমের স্মৃতিই তিনি পার্বতী চরিত্রে ধরে রাখার চেষ্টা করেছিলেন। চন্দ্রমুখীর চরিত্র আদতে কালিদাসী নামের এক বাস্তব নর্তকীর ওপর ভিত্তি করে রচিত। এক বন্ধুর সঙ্গে লেখক সেই নর্তকীর গান শুনতে গিয়েছিলেন। আর ধর্মদাসের চরিত্রটি গড়ে উঠেছে তাঁর মামার বাড়িতে দেখা এক সেবকমশাইকে কেন্দ্র করে।

ছন্নছাড়া মহাপ্রাণ, বিষ্ণু প্রভাকর, অনুবাদ : দেবলীনা ব্যানার্জি কেজরিওয়াল

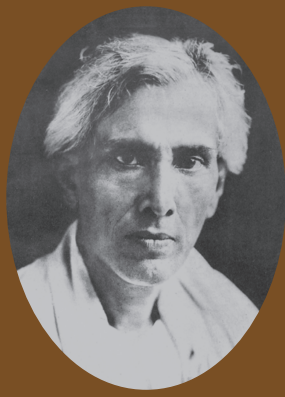

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১৫ সেপ্টেম্বর ১৮৭৬ সালে হুগলি জেলার দেবানন্দপুর গ্রামে জন্ম। তাঁর বাল্য-কৈশোর কাটে ভাগলপুরে। শরৎচন্দ্র এফ.এ. পরীক্ষা দিতে পারেননি। তাঁর বিধিমত লেখাপড়া এখানেই শেষ। ভারতবর্ষের নানাস্থানে তিনি ঘুরেছেন, ভাগ্যান্বেষণে তিনি ব্রহ্মদেশে যান এবং বারো-তেরো বৎসর রেঙ্গুনে কেরানিগিরি করেন।

১৩১৪ বঙ্গাব্দে—বৈশাখ আষাঢ় সংখ্যার ভারতীতে 'বড়দিদি' নামক গল্প প্রকাশিত হবার পর তিনি রসিক জনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি পাঠক সমাজে সুপরিচিত হন।

শরৎচন্দ্র মূলত ঔপন্যাসিক, যদিও কয়েকটি ছোটগল্প এবং বেশ কিছু সংখ্যক প্রবন্ধও তিনি রচনা করেছেন। তাঁর প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ *বড়দিদি* (১৯১৩)। অন্যান্য গ্রন্থগুলির মধ্যে *বিরাজ বৌ* (১৯১৪), *বিন্দুর ছেলে* (১৯১৪), *পরিণীতা* (১৯১৪), *পণ্ডিতমশাই* (১৯১৪), *মেজদিদি* (১৯১৫), *পল্লীসমাজ* (১৯১৬), *শ্রীকান্ত* (১ম খণ্ড ১৯১৭, ২য় খণ্ড ১৯১৮, ৩য় খণ্ড ১৯২৭, ৪র্থ খণ্ড ১৯৩৩), *দেবদাস* (১৯১৭), *চরিত্রহীন* (১৯১৭), *গৃহদাহ* (১৯২০), *পথের দাবী*, *শেষপ্রশ্ন* (১৯৩১) প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

তাঁর প্রায় প্রত্যেকটি গ্রন্থই অসামান্য জনপ্রিয়। প্রকৃতপক্ষে বাংলা সাহিত্যে তিনি সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় লেখক।

১৬ জানুয়ারি ১৯৩৮ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

প্রথম পরিচ্ছেদ

একদিন বৈশাখের দ্বিপ্রহরে রৌদ্রেরও অন্ত ছিল না, উত্তাপেরও সীমা ছিল না। ঠিক সেই সময়টিতে মুখুয্যেদের দেবদাস পাঠশালা-ঘরের এক কোণে ছেঁড়া মাদুরের উপর বসিয়া, শ্লেট হাতে লইয়া, চক্ষু চাহিয়া, বুজিয়া, পা ছড়াইয়া, হাই তুলিয়া, অবশেষে হঠাৎ খুব চিন্তাশীল হইয়া উঠিল; এবং নিমিষে স্থির করিয়া ফেলিল যে, এই পরম রমণীয় সময়টিতে মাঠে মাঠে ঘুড়ি উড়াইয়া বেড়ানোর পরিবর্তে পাঠশালায় আবদ্ধ থাকাটা কিছু নয়। উর্বর মস্তিষ্কে একটা উপায়ও গজাইয়া উঠিল। সে শ্লেট-হাতে উঠিয়া দাঁড়াইল।

পাঠশালায় এখন টিফিনের ছুটি হইয়াছিল। বালকের দল নানারূপ ভাবভঙ্গি ও শব্দসাড়া করিয়া অনতিদূরের বটবৃক্ষতলে ডাংগুলি খেলিতেছিল। দেবদাস সেদিকে একবার চাহিল। টিফিনের ছুটি সে পায় না—কেননা গোবিন্দ পণ্ডিত অনেকবার দেখিয়াছেন যে, একবার পাঠশালা হইতে বাহির হইয়া পুনরায় প্রবেশ করাটা দেবদাস নিতান্ত অপছন্দ করে। তাহার পিতারও নিষেধ ছিল। নানা কারণে ইহাই স্থির হইয়াছিল যে এই সময়টিতে সে সর্দার-পোড়ো ভুলোর জিম্মায় থাকিবে।

এখন ঘরের মধ্যে শুধু পণ্ডিত মহাশয় দ্বিপ্রাহরিক আলস্যে চক্ষু মুদিয়া শয়ন করিয়াছিলেন এবং সর্দার-পোড়ো ভুলো এক কোণে হাত-পা ভাঙা একখণ্ড বেঞ্চের উপর ছোটখাটো পণ্ডিত সাজিয়া বসিয়াছিল এবং মধ্যে মধ্যে নিতান্ত তাচ্ছিল্যের সহিত কখন বা ছেলেদের খেলা দেখিতেছিল, কখন বা দেবদাস এবং পার্বতীর প্রতি আলস্য-কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতেছিল। পার্বতী এই মাসখানেক হইল পণ্ডিত মহাশয়ের আশ্রয়ে এবং তত্ত্বাবধানে আসিয়াছে। পণ্ডিত মহাশয় সম্ভবত এই অল্পসময়ের মধ্যেই তাহার একান্ত মনোরঞ্জন করিয়াছিলেন, তাই সে নিবিষ্টমনে, নিরতিশয় ধৈর্যের সহিত সুপ্ত পণ্ডিতের প্রতিকৃতি বোধোদয়ের শেষ পাতাটির উপর কালি দিয়া লিখিতেছিল এবং দক্ষ চিত্রকরের ন্যায় নানাভাবে দেখিতেছিল যে, তাহার বহু-যত্নের চিত্রটি আদর্শের সহিত কতখানি মিলিয়াছে। বেশি যে মিল ছিল তাহা নয়; কিন্তু পার্বতী ইহাতেই যথেষ্ট আনন্দ ও আত্মপ্রসাদ উপভোগ করিতেছিল।

এই সময় দেবদাস শ্লেট-হাতে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং ভুলোর উদ্দেশে ডাকিয়া বলিল, অঙ্ক হয় না।

ভুলো শান্ত গম্ভীরমুখে কহিল, কী আঁক?

মণকষা—

শেলেটটা দেখি—

ভাবটা এই যে, তাহার নিকট এ-সব কাজে শ্লেটখানি হাতে পাওয়ার অপেক্ষা মাত্র। দেবদাস তাহার হাতে শ্লেট দিয়া নিকটে দাঁড়াইল। ভুলো ডাকিয়া লিখিতে লাগিল যে, এক মণ তেলের দাম যদি চৌদ্দ টাকা নয় আনা তিন গণ্ডা হয়, তাহা হইলে—

এমনি সময়ে একটা ঘটনা ঘটিল। হাত-পা-ভাঙা বেঞ্চখানার উপর সর্দার-পোড়ো তাহার পদমর্যাদার উপযুক্ত আসন নির্বাচন করিয়া যথানিয়মে আজ তিন বৎসর ধরিয়া প্রতিদিন বসিয়া আসিতেছে। তাহার পশ্চাতে একরাশি চুন গাদা করা ছিল। এটি পণ্ডিত মহাশয় কবে কোন্ যুগে নাকি সস্তা দরে কিনিয়া রাখিয়াছিলেন মানস ছিল, সময় ভাল হইলে ইহাতে কোঠা-দালান দিবেন। কবে যে সে শুভদিন আসিবে তাহা জানি না। কিন্তু এই শ্বেত-চূর্ণের প্রতি তাঁহার সতর্কতা এবং যত্নের অবধি ছিল না। সংসারানভিজ্ঞ, অপরিণামদর্শী কোন অলক্ষ্মী-আশ্রিত বালক ইহার রেণুমাত্র নষ্ট না করিতে পারে, এইজন্য প্রিয়পাত্র এবং অপেক্ষাকৃত বয়স্ক ভোলানাথ এই সযত্ন-সঞ্চিত বস্তুটি সাবধানে রক্ষা করিবার ভার পাইয়াছিল এবং তাই সে বেঞ্চের উপর বসিয়া ইহাকে আগুলিয়া থাকিত।

ভোলানাথ লিখিতেছিল—এক মণ তেলের দাম যদি চৌদ্দ টাকা নয় আনা তিন গণ্ডা হয়, তাহা হইলে,—ওগো বাবা গো—তাহার পর খুব শব্দ-সাড়া হইল। পার্বতী ভয়ানক উচ্চকণ্ঠে চেঁচাইয়া হাততালি দিয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িল। সদ্যঃনিদ্রোত্থিত গোবিন্দ পণ্ডিত রক্তনেত্রে একেবারে উঠিয়া দাঁড়াইলেন; দেখিলেন, গাছতলায় ছেলের দল একেবারে সার বাঁধিয়া হইহই শব্দে ছুটিয়া চলিয়াছে, এবং তখনি চক্ষে পড়িল যে, ভগ্ন বেঞ্চের উপর একজোড়া পা নাচিয়া বেড়াইতেছে এবং চুনের মধ্যে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত হইতেছে। চিৎকার করিলেন, কি—কি—কি রে!

বলিবার মধ্যে শুধু পার্বতী ছিল। কিন্তু সে তখন ভূমিতলে লুটাইতেছে এবং করতালি দিতেছে। পণ্ডিত মহাশয়ের বিফল প্রশ্ন ক্রুদ্ধভাবে ফিরিয়া গেল, কি কি—কি রে!

তাহার পর শ্বেতমূর্তি ভোলানাথ চুন ঠেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। পণ্ডিত মহাশয় আবার চিৎকার করিলেন, গুয়োটা তুই!—তুই ওর ভেতর!

অ্যাঁ—অ্যাঁ—অ্যাঁ—

আবার!

দেব শালা—ঠেলে—অ্যাঁ—অ্যাঁ—মণকষা—

আবার গুয়োটা!

কিন্তু পরক্ষণেই সমস্ত ব্যাপারটা বুঝিয়া লইয়া, মাদুরের উপর উপবেশন করিয়া প্রশ্ন করিলেন, দেবা ঠেলে ফেলে দিয়ে পালিয়েচে?

ভুলো আরো কাঁদিতে লাগিল—অ্যাঁ—অ্যাঁ—অ্যাঁ—

তাহার পর অনেকক্ষণ ধরিয়া চুন ঝাড়াঝাড়ি হইল, কিন্তু সাদা এবং কালো রঙে সর্দার-পোড়োকে কতকটা ভূতের মত দেখাইতে লাগিল এবং তখনও তাহার ক্রন্দনের নিবৃত্তি হইল না।

পণ্ডিত বলিলেন, দেবা ঠেলে ফেলে পালিয়েচে? বটে?

ভুলো বলিল—অ্যাঁ—অ্যাঁ—

পণ্ডিত বলিলেন, এর শোধ নেব।

ভুলো কহিল,—অ্যাঁ—অ্যাঁ—অ্যাঁ—

পণ্ডিত প্রশ্ন করিলেন, ছোঁড়াটা কোথায়—

তাহার পর ছেলেদের দল রক্তমুখে হাঁপাইতে হাঁপাইতে ফিরিয়া আসিয়া জানাইল, দেবাকে ধরা গেল না। উঃ—যে ইট ছোড়ে—!

ধরা গেল না?

আর একজন বালক পূর্বকথার প্রতিধ্বনি করিল—উঃ—যে—

থাম বেটা—

সে ঢোক গিলিয়া একপাশে সরিয়া গেল। নিষ্ফল-ক্রোধে পণ্ডিতমশাই প্রথমে পার্বতীকে খুব ধমকাইয়া উঠিলেন; তাহার পর ভোলানাথের হাত ধরিয়া কহিলেন, চল্, একবার কাছাড়িবাড়িতে কর্তাকে বলে আসি।

ইহার অর্থ এই যে, জমিদার নারায়ণ মুখুয্যের নিকট তাঁহার পুত্রের আচরণের নালিশ করিবেন।

তখন বেলা তিনটা আন্দাজ হইয়াছিল। নারায়ণ মুখুয্যেমশায় বাহিরে বসিয়া গড়গড়ায় তামাক খাইতেছিলেন এবং একজন ভৃত্য হাতপাখা লইয়া বাতাস করিতেছিল। সছাত্র পণ্ডিতের অসময় আগমনে কিছু বিস্মিত হইয়া কহিলেন, গোবিন্দ যে!

গোবিন্দ জাতিতে কায়স্থ—ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া ভুলোকে দেখাইয়া সমস্ত কথা সবিস্তারে বর্ণনা করিলেন। মুখুয্যেমশায় বিরক্ত হইলেন; বলিলেন, তাইতো, দেবদাস যে শাসনের বাইরে গেছে দেখচি!

কী করি, আপনি হুকুম করুন।

জমিদারবাবু নলটা রাখিয়া দিয়া কহিলেন, কোথা গেল সে?

তা কি জানি? যারা ধরতে গিয়েছিল, তাদের ইট মেরে তাড়িয়েচে।

তাঁহারা দুইজনেই কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। নারায়ণবাবু বলিলেন, বাড়ি এলে যা হয় করব।

গোবিন্দ ছাত্রের হাত ধরিয়া পাঠশালায় ফিরিয়া গিয়া মুখ ও চোখের ভাবভঙ্গিতে সমস্ত পাঠশালা সন্ত্রাসিত করিয়া তুলিলেন এবং প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, দেবদাসের পিতা সে অঞ্চলের জমিদার হইলেও তাহাকে আর পাঠশালে

ঢুকিতে দিবেন না। সেদিন পাঠশালার ছুটি কিছু পূর্বেই হইল; যাইবার সময় ছেলেরা অনেক কথা বলাবলি করিতে লাগিল।

একজন কহিল, উঃ! দেবা কী ষণ্ডা দেখেচিস!

আর একজন কহিল, ভুলোকে আচ্ছা জব্দ করেচে।

উঃ, কী ঢিল ছোড়ে!

আর একজন ভুলোর তরফ হইতে কহিল,—ভুলো শোধ নেবে দেখিস।

ইস্—সে ত আর পাঠশালায় আসবে না যে শোধ নেবে।

এই ক্ষুদ্র দলটির একপাশে পার্বতীও বই-শ্লেট লইয়া বাড়ি আসিতেছিল। সে নিকটবর্তী একজন ছেলের হাত ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, মণি, দেবদাদাকে আর পাঠশালায় সত্যি আসতে দেবে না?

মণি বলিল, না—কিছুতেই না।

পার্বতী সরিয়া গেল—কথাটা তার বরাবরই ভাল লাগে নাই।

পার্বতীর পিতার নাম নীলকণ্ঠ চক্রবর্তী। চক্রবর্তী মহাশয় জমিদারের প্রতিবেশী অর্থাৎ মুখুয্যে মহাশয়ের খুব বড় বাড়ির পার্শ্বে তাঁহার ছোট এবং পুরাতন সেকেলে ইটের বাড়ি। তাঁহার দু-দশ বিঘা জমিজমা আছে, দু-চার ঘর যজমান আছে, জমিদারবাড়ির আশা-প্রত্যাশাটা আছে,—বেশ স্বচ্ছন্দ পরিবার—বেশ দিন কাটে।

প্রথমে ধর্মদাসের সহিত পার্বতীর সাক্ষাৎ হইল। সে দেবদাসের বাটীর ভৃত্য। এক বৎসর বয়স হইতে আজ দ্বাদশবর্ষ বয়স পর্যন্ত তাহাকে লইয়াই আছে—পাঠশালায় পৌঁছিয়া দিয়া আসে এবং ছুটির সময় সঙ্গে করিয়া বাটী ফিরাইয়া আনে। এ কাজটি সে যথানিয়মে প্রত্যহ করিয়াছে এবং আজিও সেইজন্যই পাঠশালায় যাইতেছিল। পার্বতীকে দেখিয়া কহিল, কই পারু, তোর দেবদাদা কোথায়?

পালিয়ে গেছে—

ধর্মদাস ভয়ানক আশ্চর্য হইয়া বলিল, পালিয়ে গেছে কি রে?

তখন পার্বতী ভোলানাথের দুর্দশার কথা মনে করিয়া আবার নূতন করিয়া হাসিতে শুরু করিল,—দেখ্ ধম্ম, দেবদা—হি হি হি—একেবারে চুনের গাদায়—হি হি—হু হু—একেবারে ধম্ম চিৎ করে—

ধর্মদাস সব কথা বুঝিতে না পারিলেও হাসি দেখিয়া খানিকটা হাসিয়া লইল; পরে হাস্য সংবরণ করিয়া জিদ করিয়া কহিল, বল না পারু, কী হয়েচে?

দেবদা ঠেলে ফেলে দিয়ে—ভুলোকে—চুনের গাদায়—হি হি হি—

ধর্মদাস এবার বাকিটা বুঝিয়া লইল এবং অতিশয় চিন্তিত হইল; বলিল, পারু, সে এখন কোথায় আছে জানিস?

আমি কি জানি!

তুই জানিস—বলে দে। আহা তার বোধ হয় খুব খিদে পেয়েচে।

তা ত পেয়েচে—আমি কিন্তু বলব না।

কেন বলবি নে?

বললে আমাকে বড় মারবে। আমি খাবার দিয়ে আসব।

ধর্মদাস কতকটা সন্তুষ্ট হইল—কহিল, তা দিয়ে আসিস, আর সন্ধ্যের আগে ভুলিয়ে-ভালিয়ে বাড়ি ডেকে আনিস।

আনব।

বাটীতে আসিয়া পার্বতী দেখিল, তাহার মা এবং দেবদাসের মা উভয়েই সব কথা শুনিয়াছেন। তাহাকেও এ কথা জিজ্ঞাসা করা হইল। হাসিয়া গম্ভীর হইয়া সে যতটা পারিল কহিল। তাহার পর আঁচলে মুড়ি বাঁধিয়া জমিদারদের একটা আমবাগানের ভিতর প্রবেশ করিল। বাগানটা তাহাদেরই বাটীর নিকটে, এবং ইহারই একান্তে একটা বাঁশঝাড় ছিল। সে জানিত, লুকাইয়া তামাক খাইবার জন্য দেবদাস এই বাঁশঝাড়ের মধ্যে কতকটা স্থান পরিষ্কার করিয়া রাখিয়াছিল। পলাইয়া লুকাইয়া থাকিতে হইলে ইহাই তাহার গুপ্তস্থান। ভিতরে প্রবেশ করিয়া পার্বতী দেখিল, বাঁশঝোপের মধ্যে দেবদাস ছোট একটা হুঁকা-হাতে বসিয়া আছে এবং বিজ্ঞের মত ধূমপান করিতেছে। মুখখানা বড়ো গম্ভীর—যথেষ্ট দুর্ভাবনার চিহ্ন তাহাতে প্রকাশ পাইতেছে। পার্বতীকে দেখিতে পাইয়া সে খুব খুশি হইল, কিন্তু বাহিরে প্রকাশ করিল না। তামাক টানিতে টানিতে গম্ভীরভাবেই কহিল, আয়।

পার্বতী কাছে আসিয়া বসিল। আঁচলে যাহা বাঁধা ছিল, তৎক্ষণাৎ দেবদাসের চক্ষে পড়িল। কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া সে তাহা খুলিয়া খাইতে আরম্ভ করিয়া কহিল, পারু, পণ্ডিতমশাই কী বললে রে?

জ্যাঠামশায়ের কাছে বলে দিয়েচে।

দেবদাস হুঁকা নামাইয়া চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া কহিল, বাবাকে বলে দিয়েচে?

হাঁ।

তারপর?

তোমাকে আর পাঠশালায় যেতে দেবে না।

আমি পড়তেও চাই না।

এই সময়ে তাহার খাদ্যদ্রব্য প্রায় ফুরাইয়া আসিল, দেবদাস পার্বতীর মুখপানে চাহিয়া বলিল, সন্দেশ দে।

সন্দেশ ত আনিনি।

তবে জল দে।

জল কোথায় পাব?

বিরক্ত হইয়া দেবদাস কহিল, কিছুই নেই, ত এসেচিস কেন? যা, জল নিয়ে আয়।

তাহার রুক্ষস্বর পার্বতীর ভাল লাগিল না; কহিল, আমি আবার যেতে পারিনে—তুমি খেয়ে আসবে চল।

আমি কি এখন যেতে পারি?

তবে কি এইখানেই থাকবে?

এইখানে থাকব, তারপর চলে যাব—

পার্বতীর মনটা খারাপ হইয়া গেল। দেবদাসের আপাত-বৈরাগ্য দেখিয়া এবং কথাবার্তা শুনিয়া তাহার চোখে জল আসিতেছিল,—কহিল, দেবদা, আমিও যাব।

কোথায়? আমার সঙ্গে? দূর—তা কি হয়?

পার্বতী মাথা নাড়িয়া কহিল, যাবই—

না,—যেতে হবে না—তুই আগে জল নিয়ে আয়—

পার্বতী আবার মাথা নাড়িয়া বলিল, আমি যাবই—

আগে জল নিয়ে আয়—

আমি যাব না—তুমি তা হলে পালিয়ে যাবে।

না—যাব না।

কিন্তু পার্বতী কথাটা বিশ্বাস করিতে পারিল না, তাই বসিয়া রহিল। দেবদাস পুনরায় হুকুম করিল, যা বলচি!

আমি যেতে পারব না।

রাগ করিয়া দেবদাস পার্বতীর চুল ধরিয়া টান দিয়া ধমক দিল—যা বলচি।

পার্বতী চুপ করিয়া রহিল। তারপর তাহার পিঠে একটা কিল পড়িল—যাবিনে?

পার্বতী কাঁদিয়া ফেলিল—আমি কিছুতেই যাব না।

দেবদাস একদিকে চলিয়া গেল। পার্বতীও কাঁদিতে কাঁদিতে একেবারে দেবদাসের পিতার সুমুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। মুখুয্যেমশাই পার্বতীকে বড়ো ভালবাসিতেন। বলিলেন, পারু, কাঁদচিস কেন মা?

দেবদা মেরেচে।

কোথায় সে?

ঐ বাঁশবাগানে বসে তামাক খাচ্ছিল।

একে পণ্ডিত মহাশয়ের আগমন হইতেই তিনি চটিয়া বসিয়াছিলেন—এখন এই সংবাদটা তাঁহাকে একেবারে অগ্নিমূর্তি করিয়া দিল। বলিলেন, দেবা বুঝি আবার তামাক খায়?

হাঁ খায়, রোজ খায়। বাঁশবাগানে তার হুঁকো নুকোন আছে—

এতদিন আমাকে বলিস নি কেন?

দেবদাদা মারবে বলে।

কথাটা কিন্তু ঠিক তাই নহে। প্রকাশ করিলে দেবদাস পাছে শাস্তি ভোগ

করে, এই ভয়ে সে কোন কথা বলে নাই। আজ কথাটা শুধু রাগের মাথায় বলিয়া দিয়াছে। এই তাহার সবে আট বৎসরমাত্র বয়স—রাগ এখন বড় বেশি; কিন্তু তাই বলিয়া তাহার বুদ্ধি-বিবেচনা নিতান্ত কম ছিল না। বাড়ি গিয়া বিছানায় শুইয়া অনেকক্ষণ কাঁদিয়া-কাটিয়া ঘুমাইয়া পড়িল,—সে রাত্রে ভাত পর্যন্ত খাইল না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

দেবদাসকে পরদিন খুব মারধর করা হইল,—সমস্তদিন ঘরে রুদ্ধ করিয়া রাখা হইল। তাহার পর, তাহার জননী যখন ভারি কান্নাকাটি করিতে লাগিলেন, তখন দেবদাসকে ছাড়িয়া দেওয়া হইল। পরদিন ভোরবেলায় সে পলাইয়া আসিয়া পার্বতীর ঘরের জানালার নিকট দাঁড়াইল—ডাকিল, পারু! আবার ডাকিল, পারু!

পার্বতী জানালা খুলিয়া কহিল, দেবদা!

দেবদাস ইশারা করিয়া বলিল, শিগগির আয়। দু'জনে একত্র হইলে দেবদাস বলিল, তামাক খাবার কথা বলে দিলি কেন?

তুমি মারলে কেন?

তুই জল আনতে গেলি না কেন?

পার্বতী চুপ করিয়া রহিল।

দেবদাস বলিল, তুই বড় গাধা—আর যেন বলে দিসনে।

পার্বতী মাথা নাড়িয়া বলিল, না।

তবে চল্, ছিপ কেটে আনি। আজ বাঁধে মাছ ধরতে হবে।

বাঁশঝাড়ের নিকট একটা নোনাগাছ ছিল, দেবদাস তাহাতে উঠিয়া পড়িল। বহুকষ্টে একটা বাঁশের ডগা নোয়াইয়া পার্বতীকে ধরিতে দিয়া কহিল, দেখিস যেন ছেড়ে দিসনে, তা হলে পড়ে যাব।

পার্বতী প্রাণপণে টানিয়া ধরিয়া রহিল। দেবদাস সেইটা ধরিয়া একটা নোনাডালে পা রাখিয়া, ছিপ কাটিতে লাগিল। পার্বতী নিচে হইতে কহিল, দেবদা, পাঠশালে যাবে না?

না।

জ্যাঠামশাই তোমাকে পাঠিয়ে দেবেন।

বাবা আপনি বলেচেন, আমি আর ওখানে পড়ব না। বাড়িতে পণ্ডিত আসবে।

পার্বতী একটু চিন্তিত হইয়া উঠিল। পরে বলিল, কাল থেকে গরমের জন্য আমাদের সকালবেলা পাঠশালা বসে, আমি এখনি যাব।

দেবদাস উপর হইতে চক্ষু রাঙাইয়া বলিল, না, যেতে হবে না।

এই সময়ে পার্বতী একটু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িল,—অমনি বাঁশের ডগা উপরে উঠিয়া গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে দেবদাস নোনাডাল হইতে নিচে পড়িয়া গেল। বেশি উঁচু ছিল না বলিয়া তেমন লাগিল না, কিন্তু গায়ে অনেক স্থানে ছড়িয়া গেল। নিচে আসিয়া ক্রুদ্ধ দেবদাস একটা শুষ্ক কঞ্চি তুলিয়া লইয়া পার্বতীর পিঠের উপর, গালের উপর, যেখানে-সেখানে সজোরে ঘা-কতক বসাইয়া দিয়া বলিল, যা, দূর হয়ে যা।

প্রথমে পার্বতী নিজেই লজ্জিত হইয়া পড়িয়াছিল; কিন্তু যখন ছড়ির পর ছড়ি ক্রমাগত পড়িতে লাগিল, তখন সে ক্রোধে ও অভিমানে চক্ষু-দুটি আগুনের মত করিয়া কাঁদিয়া বলিল, এই আমি জ্যাঠামশায়ের কাছে যাচ্ছি—

দেবদাস রাগিয়া আর এক ঘা বসাইয়া দিয়া বলিল, যা, এখনি বলে দিগে যা—বয়ে গেল।

পার্বতী চলিয়া গেল। যখন অনেকটা গিয়াছে, তখন দেবদাস ডাকিল, পারু!

পার্বতী শুনিয়াও শুনিল না—আরও দ্রুত চলিতে লাগিল। দেবদাস আবার ডাকিল, ও পারু, শুনে যা না!

পার্বতী জবাব দিল না। দেবদাস বিরক্ত হইয়া, কতকটা চিৎকার করিয়া, কতকটা আপনার মনে বলিল, যাক—মরুক গে।

পার্বতী চলিয়া গেলে, দেবদাস যেমন-তেমন করিয়া দুই-একটা ছিপ কাটিয়া লইল। তাহার মনটা বিগড়াইয়া গিয়াছিল। কাঁদিতে কাঁদিতে পার্বতী বাড়ি ফিরিয়া আসিল। তাহার গালের উপর দাগ নীল হইয়া ফুলিয়া রহিয়াছে। প্রথমেই ঠাকুরমার চক্ষে পড়িল। তিনি চেঁচাইয়া উঠিলেন—ওগো, মা গো, কে এমন করে মারলে পারু?

চোখ মুছিতে মুছিতে পার্বতী কহিল, পণ্ডিতমশাই।

ঠাকুরমা তাহাকে ক্রোড়ে লইয়া ভয়ানক ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, চল্ ত একবার নারাণের কাছে যাই, দেখি সে কেমন পণ্ডিত! আহা—বাছাকে একেবারে মেরে ফেলেচে!

পার্বতী পিতামহীর গলা জড়াইয়া কহিল, চল।

মুখুয্যে মহাশয়ের নিকট আসিয়া পিতামহী পণ্ডিত মহাশয়ের অনেকগুলি পুরুষের উল্লেখ করিয়া তাহাদিগের পারলৌকিক অশুভ ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন এবং খাদ্যদ্রব্যেরও তেমন ভাল ব্যবস্থা করিলেন না। শেষে স্বয়ং গোবিন্দকে নানামতে গালি পাড়িয়া বলিলেন, নারাণ, দেখ ত মিনসের আস্পর্ধা! শুদ্দুর হয়ে বামুনের মেয়ের গায়ে হাত তোলে! কী করে মেরেচে একবার দেখ। বলিয়া গালের উপর নীল দাগগুলা বৃদ্ধা অত্যন্ত বেদনার সহিত দেখাইতে লাগিলেন।

নারায়ণবাবু তখন পার্বতীকেই প্রশ্ন করিলেন, কে মেরেচে পারু?